পরিবেশের পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহঃ

বাংলাদেশের **এক নম্বর সমস্যা এবং অন্যতম প্রধান** চ্যালেঞ্জ- জনসংখ্যা সমস্যা।

বাংলাদেশ **জনসংখ্যাকে এক নম্বর সমস্যা বলে ঘোষণা** করে - **১৯৭৭** সালে।

বাংলাদেশের **মোট জনসংখ্যার -২৫শতাংশ** বেকার।

বিবিধ চ্যালেঞ্জসমূহঃ

বাংলাদেশে **দূষণের মাত্রা সর্বাধিক** -বুড়িগঙ্গা নদীতে।

বাংলাদেশে **সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা**- চাঁদপুর।

বাংলাদেশের **৬৪ টি জেলার মধ্যে ৬১টি** জেলা আর্সেনিকের শিকার।

বাংলাদেশে **সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহর**-নারায়ণগঞ্জ।

শব্দের মাত্রা যে পরিমাণের বেশি হলে তাকে শব্দ দূষণ ধলে- ৮০ ডেসিবল।

বাংলাদেশে **ঢাকা শহরে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়- ১** জানুয়ারি, ২০০২ সালে।

সারাদেশে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়- ১লা মার্চ, ২০০২ সালে।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম শিকার- সোনালী ব্যাঙ এবং হারলেকুইন ব্যাঙ।

Source: The Daily star

বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তনঃ
পরিবেশ

পরিবেশকে **দুই ভাগে** ভাগ করা যায়।

১। **নিয়ন্ত্রণযোগ্য** পরিবেশ। যেমনঃ **কৃত্তিম** পরিবেশ।

২।**অনিয়ন্ত্রণযোগ্য** পরিবেশ। যেমনঃ যে কোন **স্বাভাবিক প্রাকৃতিক** পরিবেশ।

আবহাওয়া এবং জলবায়ু

কোনাে স্থানের **বাতাসের তাপ, উষ্ণতা, চাপ, আর্দ্রতা, মেঘ, বৃষ্টি, জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, বায়ু প্রবাহ** প্রভৃতির দৈনন্দিন অবস্থাকে ঐ স্থানের **আবহাওয়া** বলে ।

কোন একটি অ**ঞ্চলের ৩০/৪০ বছরের গড় আবহাওয়াকে** জলবায়ু বলা হয়।

আবহাওয়া এবং জলবায়ুর উপাদান- বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহ, বায়ুর আদ্রতা, বারিপাত।

জলবায়ুর নিয়ামকসমূহ- অক্ষাংশ, সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, বায়ু প্রবাহ, সমুদ্র স্রোত, পর্বতের অবস্থান, ভূমির ঢাল, মৃত্তিকার গঠন, বনভূমির অবস্থান ইত্যাদি।

মেটিওরোলজী হল **আবহাওয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞান**।

বাতাসে **জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে বায়ুর আর্দ্রতা** বলে।

বায়ু প্রবাহিত হয়— **উচ্চ চাপের স্থান থেকে নিম্নচাপের দিকে**।

বাতাসে **জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বাড়লে বায়ুর চাপ কমে** যায় ।

ভূপৃষ্ঠ থেকে **উপরের দিকে বায়ুচাপ ক্রমশ কমতে** থাকে।

বায়ুচাপ মাপা হয় **ব্যারোমিটার** দ্বারা।

ব্যারোমিটার source: Celestaire, Inc.

বাংলাদেশের আবহাওয়া, পরিবেশ জলবায়ুঃ
বাংলাদেশের **জলবায়ু**- সমভাবাপন্ন।

বাংলাদেশের **বার্ষিক গড় তাপমাত্রা-** ২৬.০১° সেলসিয়াস।

বাংলাদেশের **গড় বৃষ্টিপাত** - ২০৩ সেন্টিমিটার।

বাংলাদেশের **জলবায়ুর ধরন**— ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু।

বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস— **এপ্রিল** ।

বাংলাদেশের শীতলতম মাস -**জানুয়ারি**।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশে মোট **ভূমির ২৫% বনভূমি** থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে **মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি** থাকার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আছে মাত্র **১৭.৫ ভাগ।**

বাংলাদেশ **পরিবেশ আইনজীবী সমিতি** - বেলা (BELA) = Bangladesh Environmental Lawyers Association;

বেলা প্রতিষ্ঠিত হয়—১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে।

বাংলাদেশের **পরিবেশ আদালত-** ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে অবস্থিত।

বাংলাদেশের **প্রথম জাতীয় পরিবেশ নীতি** হয়-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে।

বাংলাদেশের **আবহাওয়া অধিদপ্তর-** ঢাকার আগারগাঁওয়ে, (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে)

বাংলাদেশে **ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র-** ৪টি (চট্টগ্রাম, ঢাকা, রংপুর ও সিলেট)।

বাংলাদেশে **আবহাওয়া স্টেশন**—৪১ টি।
জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের প্রধান উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কৌশল ও এ্যাকশন ২০০৯ **(Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009)** এর বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ **১৯৯০ সালের ২ আগস্ট মন্ট্রিল প্রটোকল** স্বাক্ষর করে।

(মন্ট্রিল চুক্তি বা **মন্ট্রিল প্রটোকল** হচ্ছে **ওজোন স্তর রক্ষা করার জন্যে** একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি।ওজোন স্তরকে রক্ষা করার জন্যে **১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর** স্বাক্ষরিত **হয় মন্ট্রিল চুক্তি**, এবং ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এটি কার্যকর হয়।)

জীববৈচিত্র আইন সংসদে পাশ হয়- ২০১৭ সালে।

সংবিধানের **পঞ্চদশ সংশাোধনীতে** পরিবেশ ও **জীববৈচিত্র্য সংক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য** নতুন **১৮ অনুচ্ছেদ** সংযোজন করা হয়েছে।

সবুজ অর্থনীতি (Green Economy):

পরিবেশ সংরক্ষণ করে **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে** যে অর্থনীতি কাজ করে তাকে **সবুজ অর্থনীতি** বলে।

পরিবেশ সংক্রান্ত দিবস, সম্মেলন এবং উদ্যোগঃ

স্টকহোম সম্মেলন:

১৯৭২ সালের স্টকহোম সম্মেলনটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশসংক্রান্ত নিয়মকানুন গঠনে অনিবার্য ভূমিকা পালন করে। সম্মেলনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এগুলো হচ্ছেঃ

১। এই সম্মেলনে পরিবেশ রক্ষার জন্য একটি **অ্যাকশন প্ল্যান** (Action plan) গ্রহণ করা হয়।

২।৫ **জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়**।

৩।এই সম্মেলনে **ইউএনইপি** (United Nation Environment Programme-UNEP) গঠনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর **সদর দপ্তর কেনিয়ার নাইরা◌েবিতে**।

ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন:

১৯৮৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ পরিবেশ ও উন্নয়নবিষয়ক বিশ্বকমিশন (The World Cominission on Envrionment and Development)গঠন করে। . কমিশনকে **তিনটি** (find out) **উদ্দেশ্য সম্পাদনের** দায়িত্ব প্রদান করা হয়।তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশ উন্নয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে পুনরায় পরীক্ষা করে এগুলোর বাস্তবায়নের বাস্তসম্মত প্রস্তাব পেশ করা।

মন্ট্রিল প্রটোকল :

ওজোনস্তর রক্ষা বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারি বস্তুসামগ্রী ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের **পরিবেশ কর্মসূচির** উদ্যেগে **১৯৮৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর কানাডার মন্ট্রিলে** স্বাক্ষরিত হয় মন্ট্রিল প্রটোকল । প্রটোকলটি স্বাক্ষরের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে **জাতিসংঘ ১৬ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।**

Montreal protocol source: International Institute for Sustainable Development

ধরিত্রী সম্মেলন (১৯৯২):

ব্রাজিলের রিওডি জেনেরিওতে **প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন** অনুষ্ঠিত হয় **১৯৯২ সালে**। এখানে **১৮৫টি দেশের সাড়ে তিন হাজার প্রতিনিধি অংশ নেন।** এখানকার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলঃ Agenda-21, Rio-declaration on Environment and Development, **বনাঞ্চলসংক্রান্ত নীতিমালা,** Convention on Climate Change, Convention on Biological Diversity **ইত্যাদি।**

কিয়োটো **সম্মেলন (১৯৯৭) :**

পৃথিবীর **তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রতিরোধে ১১ ডিসেম্বর '৯৭ জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়োটোতে** অনুষ্ঠিত হয় কিয়োটা সম্মেলন। সম্মেলনে **গ্রিন হাউস গ্যাস উদ্গিরণ হ্রাসে** সবাই একমত পোষণ করে এবং কিয়োটো প্রটকল স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রোটোকল **কার্যকর হয় ১৬ ফেব্রুয়ারী ,২০০৫ সালে। মোট ৬টি গ্যাস নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগ নেয়া হয় এই চুক্তিতে।**

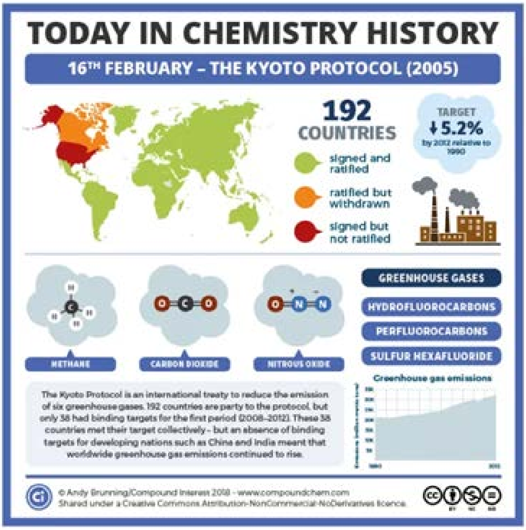

কোপেনহেগেন সম্মেলন (২০০৯):

বালি দ্বীপের সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালের ৭-১৮ ডিসেম্বর **ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে** অনুষ্ঠিত হয় **বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত ১৫তম সম্মেলন**। জলবায়ু নিয়ে পঞ্চদশ এ বিশ্ব সম্মেলনের **ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC) সামিট বা** Conference of the Parties (COP) । কোপেনহেগেন সম্মেলনে **ক্লাইমেট ফান্ড** গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

রিও+২০ সম্মেলন (২০১২):

১৯৯২ সালের পরে **২০ জুন, ২০১২** সালে পুনরায় ব্রাজিলের রিওডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয়। রিও**+২০ সম্মেলনের মূল স্লোগান ছিল দুটি** । এগুলো হলঃ

১। টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে সবুজ অর্থনীতি এবং

২। **টেকসই উন্নয়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী**

এ সম্মেলনে বলা হয়, **টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে একটি আলাদা স্তম্ভ হিসেবে মেনে নেয়া হবে।**

প্যারিস সম্মেলন(২০১৫):

২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর -১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত **ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে** জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ রূপরেখা **কনভেনসন** (UNFCCC)-**এর** COP21 অনুষ্ঠিত হয়।**প্যারিস সম্মেলনে** Adoption of the Paris Agreement শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে একটি **দীর্ঘমেয়াদী** পরিকল্পনা করা । জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় Green Climate Fund **এ** সম্মেলনেই দেশগুলোর জন্য ১০০ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করে।এই সম্মেলনে **২১০০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি** সেলসিয়াসের নিচে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পরিবেশ বিষয়ক বৈশ্বিক সংস্থাঃ

Green Peace

বেসরকারি **আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন**- গ্রিন পিস।

গ্রিন পিসের **সদর দপ্তর**- অ্যামস্টারডাম, নেদারল্যান্ড।

গ্রিন পিসের উদ্দেশ্যঃ বন্য পরিবেশ ধ্বংস, বৈশ্বিক উষ্ণতা, অধিক হারে মৎস্য স্বীকার, তিমি শিকার এবং পারমাণবিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রচারনা চালানো।

Source: Pinterest

International Maritime Organization (IMO):

বিশ্বে নৌ চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা- IMO

জাতিসংঘের **বিশেষায়িত সংস্থা**- IMO

IMO **এর সদর দপ্তর**- লন্ডনে।

IMO **এর সদস্য সংখ্যা**- ১৭২ টি।

Source: Pinterest

পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবসঃ

বিশ্ব **জলাভূমি** দিবস- ২ ফেব্রুয়ারী।

বিশ্ব **বন** দিবস- ২১ মার্চ।

বিশ্ব **পানি** দিবস- ২২ মার্চ।

বিশ্ব **ধরিত্রী** দিবস- ২২এপ্রিল।

বিশ্ব **পরিবেশ** দিবস- ৫জুন।

বিশ্ব **সমুদ্র** দিবস- ৮ জুন।

বিশ্ব **প্রাণী** দিবস- ৪ অক্টোবর।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ব্যবস্থাপনাঃ

দুর্যোগ অর্থ প্রকৃতি অথবা মানুষের সৃষ্টি অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঘটনা।

দুর্যোগর ধরনঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ ভুমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, শৈত্য প্রবাহ, সুনামি ইত্যাদি।
মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগঃ যুদ্ধ, রাসায়নিক দূষণ, অগ্নিকাণ্ড , বন ধ্বংস ইত্যাদি।

বাংলাদেশে দুর্যোগের ধরন এবং প্রকৃতিঃ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত **জাতীয় পরিকল্পনায় ১৩ টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ চিহ্নিত** করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, আর্সেনিক, খরা, লবণাক্ততা, সুনামি, অগ্নিকান্ড, ভূমিধস , বজ্রপাত।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন এবং প্রকৃতিঃ

ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) :

পৃথিবীতে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগটি **সবচেয়ে বেশি আঘাত হানে,** সেটি হলো ঘূর্ণিঝড় ।**ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রে উৎপত্তি লাভ করায় উপকূলবর্তী দেশ** বা অঞ্চলসমূহে সবচেয়ে বেশি আঘাত হানে।**প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তর ও দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে** ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে।

নিরক্ষরেখার কাছাকাছি উষ্ণ ও শীতল বায়ুর বিপরীতমুখী প্রবাহ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়।

ঘূর্ণিঝড় **কয়েক মিনিট থেকে শুরু করে কয়েক দিন** পর্যন্ত ব্যাপ্তিলাভ করে। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে দুর্যোগের সৃষ্টি হলেও **এটি পৃথিবীতে তাপের ভারসাম্য** রক্ষা করে।

Source: world health organisation

ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিঃ

বাংলাদেশে **১৯৭০ সালে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় বিশ্বের ইতিহাসে সব**চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ঘটায়।(**৫ লক্ষ**)

ঘূর্ণিঝড়ের **তীব্রতা পরিমাপের** জন্য বিভিন্ন স্কেল ব্যবহার করা হয়, তন্মধ্যে **স্যাফির সিম্পসনের স্কেলটি** সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

নিরক্ষরেখার **০ ডিগ্রি থেকে ৫ ডিগ্রির মধ্যে** কোন ঘূর্ণিঝড় হতে দেখা যায় না।

নিরক্ষরেখার **১০ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রির মধ্যে** ঘূর্ণিঝড় হতে দেখা যায় ।

উষ্ণমণ্ডলের যে সকল সাগর অক্ষাংশের **৩০ ডিগ্রি উত্তরে ও অক্ষাংশের ৩০ ডিগ্রি দক্ষিণে** অবস্থিত, সেসব সাগরেই **বেশির ভাগ** ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম হয়।

সাধারণভাবে ঘূর্ণিঝড়কে **সাইক্লোন বা ট্রপিক্যাল সাইক্লোনও** বলা হয়ে থাকে।

আটলান্টিক মহাসাগর এলাকা তথা আমেরিকার আশেপাশে **ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ১১৭ কি.মি.**-এর বেশি হয়, তখন জনগণকে এর ভয়াবহতা বুঝাতে **হ্যারিকেন** শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা তথা **চীন, জাপানের আশেপাশে হ্যারিকেন এর পরিবর্তে টাইফুন** শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

সাইক্লোন সৃষ্টি হয়—**গভীর সমুদ্রে**।

পৃথিবীর **মোট সাইক্লোনের ১৫ শতাংশ হয়**- বঙ্গোপসাগরে।

বাংলাদেশে উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চল বলে এখানে **ট্রপিক্যাল সাইক্লোন** বেশি হয় এবং এই প্রকারের **সাইক্লোন** খুবই ক্ষতিকারক।

সাইক্লোন সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে—**নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা**।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সাইক্লোন বিভিন্ন নামে পরিচিত:

বাংলাদেশ ও ভারতীয় অঞ্চলে – সাইক্লোন।

জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে – টাইফুন।

ফিলিপাইনে – বাগুইড বা বোগিও।

অস্ট্রেলিয়ায় – উইলী উইলী।

আমেরিকা ও আটলান্টিক মহাসাগরীয় অঞ্চলে – হ্যারিকেন।

কালবৈশাখী ঝড়ঃ

কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়ে **উত্তর-পশ্চিম** দিকে বয়ে যায়।

কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়ে **উত্তর-পশ্চিম** দিকে বয়ে যায়।

বাংলাদেশের **পশ্চিমাঞ্চলে সাধারণত এই ঝড় শেষ বিকেলে বা সন্ধ্যাকালে** হয়ে থাকে।

বন্যাঃ

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত হয়—শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যা।

পার্বত্য এলাকায় যে ধরনের বন্যা দেখা দেয়~ আকস্মিক বন্যা।

যে ধরণের **বন্যায় ক্ষয় ক্ষতির পরিমান বেশি**- মৌসুমি বন্যা।

বাংলাদেশে বন্যার জন্য দায়ী পানির ৯০ শতাংশ বহন করে **তিনটি নদী- পদ্মা, মেঘনা এবং যমুনা**।

source: UCA news

খরাঃ

বিশ্বের সর্বত্র খরা নামক এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। তবে **আফ্রিকার দেশসমূহে** এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

খরার প্রভাবে **অগ্নিকাণ্ডের উপদ্রব বেড়ে** যায়।

বাংলাদেশে খরার প্রকোপ **সবচেয়ে বেশি** -উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে।

খরা প্রধান অঞ্চলের ফসল- পেঁয়াজ এবং গম।

বাংলাদেশে **খরার জন্য দায়ী** - পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মেরু অঞ্চলে **সৃষ্ট এল-নিনো** (El-Nino)

খরা প্রশমনের অন্যতম উপায়-বৃক্ষ রোপণ।

source: The Daily Star

ভুমিকম্পঃ

বিশ্বে এ যাবতকালের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে **পর্তুগালের লিসবনে ১৭৭৫ সালে**। **রিখটার স্কেলে** এর কম্পন মাত্রা ছিল **৮.৪**। ভুমিকম্প **পরিমাপক যন্ত্রের** নাম-সিসমোগ্রাফ।

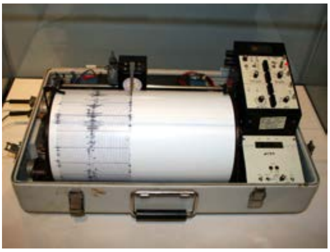

Seismometer source: Wikipedia

ভূমিকম্পের **মাত্রা নির্ণায়ক যন্ত্রের** নাম- রিখটার স্কেল।

বাংলাদেশ ভুমিকম্প বলয়গুলো পরিচিত- **সিসমিক রিস্ক জোন** নামে।

বাংলাদেশের ভুমিকম্প হয়ে থাকে- টেকনোটিক প্লেটের সংঘর্ষের কারণে ।

ভুমিকম্পের দেশ বলা হয়- জাপানকে।

বাংলাদেশে **ভুমিকম্পের ফলে বদলে গিয়েছে**- ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ। (১৮৯৭)

বাংলাদেশকে ভূমিকম্পীয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে ৩টি। যথা:

১. উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল)

২. মধ্য অঞ্চল (মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল)

৩. দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল (কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল)।

বুয়েটের গবেষকদের প্রস্তুতকৃত ভুমিকম্পের এলাকাভিত্তিক মানচিত্রে দেখা যায়, **বাংলাদেশের ৪৩% এলাকা ভূমিকম্পের উচ্চমাত্রার ঝুঁকিতে, ৪১% এলাকা মধ্যম এবং ১৬% এলাকা নিম্ন ঝুঁকিতে রয়েছে।**

সুনামিঃ

'সুনামি' জাপানি শব্দ, এর অর্থ- ঢেউ।

সমুদ্র তলদেশে ভূ-কম্পনের ফলে উপরের জলভাগে প্রবল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, একে সুনামি বলে।

সাম্প্রতিককালে ভয়াবহ সুনামি হয় ২০০৪ সালে।

২০০৪ সালের সুনামির উৎপত্তি স্থল— ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশ হতে, (প্রশান্ত মহাসাগরে)
সাধারণত ৭.৫ মাত্রার ভুমিকম্পের সাথে সুনামি সংঘটিত হয়।

Source: Zee News

আর্সেনিকঃ

আর্সেনিকের তিনটি রুপঃ

গামা, বিটা এবং আলফা।

WHO এর মতে **আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা প্রতি লিটারে ০.০১ মিলিগ্রাম** কিন্তু বাংলাদেশে রয়েছে **০.০৫ মিলিগ্রাম**।

বাংলাদেশে **৬৪ টি জেলার মধ্যে আর্সেনিক রয়েছে ৬১ টি জেলায়।**

arsenic . source: Human Rights Watch

বজ্রপাতঃ

সবচেয়ে **বেশি বজ্রপাত** হয়- **মার্চ থেকে জুন মাসে।**

বাংলাদেশ **সরকার বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে ঘোষণা** করে- **১৭মে,২০১৬ সালে।**

নদীভাঙ্গনঃ

বাংলাদেশে **নদী ভাঙ্গন বেশি হয়-** বর্ষাকালে।

নদী ভাঙনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়- চাঁদপুর এবং **সিরাজগঞ্জ** উপজেলা।

গ্রিন হাউজ ইফেক্টঃ

বায়ুর **কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন এবং অন্যান্য কিছু গ্যাসের উপস্থিতির** কারণে **ট্রপোস্ফিয়ার** অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর এর উষ্ণতা বৃদ্ধি **গ্রিনহাউস ইফেক্ট** নামে পরিচিত।
১৮৯৬ সালে **গ্রিন হাউজ** শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন **সুইডিশ রসায়নবিদ সোভনটে আরহেনিয়াস।গ্রিন হাউজ ইফেক্ট** এর জন্য মূলত **দায়ী- কার্বন ডাই অক্সাইড** (CO_2) ও **CFC, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন মনো অক্সাইড** প্রভৃতি।গ্রিন হাউজ ইফেক্টের ফলে **সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়ে গিয়ে বাংলাদেশের নিম্নভূমি নিমজ্জিত** হবে।

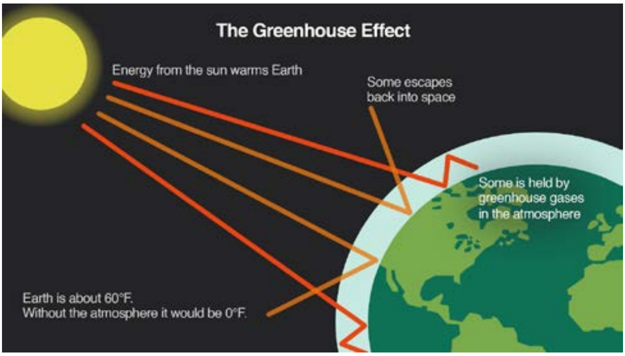

source:Climate Matters - Climate Central

এসিড বৃষ্টিঃ

সালফার ও নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ বায়ুমণ্ডলে **সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক** এসিডে পরিণত হয়ে বৃষ্টির সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসাকে এসিড বৃষ্টি বলে। **এসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী মূলত সালফার ডাই অক্সাইড।**

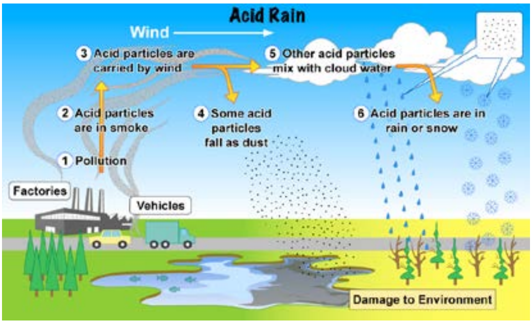

Source: BeMaster

উল্লেখযোগ্য মানবসৃষ্ট দুর্যোগঃ

১৯৮৬- ইউক্রেনের চেরনোবিলে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ পারমানবিক দুর্ঘটনা ঘটে। **২০১১-ফুকুশিমা দাই ইচি** নিউক্লীয় দুর্ঘটনা।

২০০০-ব্যারেন্ট সাগরে রাশিয়ার পারমাণবিক সাবমেরিন **কুরস্ক** নিমজ্জিত হয়।

চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনা source: The Guardian

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণকৃত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগের **প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগে সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম**। একে এক ধরণের **ব্যবহারিক বিজ্ঞান** হিসাবেও অভিহিত করা যায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছেঃ

ক. দুর্যোগের সময় জীবন, সম্পদ এবং পরিবেশের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়ে থাকে সেটি এড়ানো বা ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে আনা।

খ. প্রয়াোজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে দ্রুত সময়ে সকল প্রকার ত্রাণ পৌঁছে দেয়া এবং যথাযথ পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং

গ. দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছেঃ

১।**দুর্যোগপূর্ব** ব্যবস্থাপনা।

২।**দুর্যোগকালীন** ব্যবস্থাপনা এবং

৩।**দুর্যোগ** পরবর্তী ব্যবস্থাপনা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রঃ

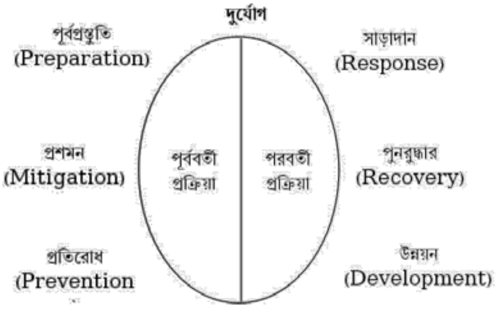

চিত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র

source:Bekar Bondhu

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার **প্রধান উপাদান** হচ্ছেঃ **দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি** দুর্যোগের **পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া** হলঃ **সাড়াদান, পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়ন।**

দুর্যোগ প্রতিরোধঃ

দুর্যোগ পুরোপুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় কিন্তু চাইলে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। দুর্যোগ প্রতিরোধের **কাঠামোগত এবং অকাঠামোগত** প্রশমন- এই দুইটি উপায়ই রয়েছে।

কাঠামোগত প্রশমনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্মাণ কার্যক্রমকে বোঝানো হয়ে থাকে। যেমনঃ **বেড়িবাঁধ তৈরি, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, পাকা ও মজবুত ঘরবাড়ি তৈরি, নদী খনন ইত্যাদি বাস্তবায়ন ইত্যাদি। অকাঠামোগত দুর্যোগ প্রতিরোধ যেমন- প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, পূর্বপ্রস্তুতি, ইত্যাদি কার্যক্রম** স্বল্প ব্যয়ে করা হয়ে থাকে।

দুর্যোগ প্রশমনঃ

দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি এবং সম্ভাব্য দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস হচ্ছে দুর্যোগ প্রশমন । বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ যেমনঃ মজবুত পাকা ভবন তৈরি করা, শস্য বহুমুখীকরণ, ভূমি ব্যবহারে বিপর্যয় হ্রাসের কৌশল নির্ণয়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শক্ত অবকাঠামোপ্রস্তুতিকরণ, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় স্থানান্তর;
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম দুর্যোগ প্রশমনের আওতায় পড়ে।

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতিঃ

দুর্যোগের আগে থেকেই **ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা,** দুর্যোগ সংক্রান্ত প্ল্যান তৈরি, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, ড্রিল বা ভূমিকা অভিনয় এবং রাস্তাঘাট, যানবাহন, বেতার যন্ত্র ইত্যাদি দুর্যোগের পূর্বে তৈরি রাখা **দুর্যোগ প্রস্তুতির মধ্যে পড়ে।**

সাড়াদানঃ

সাড়াদান বলতে বোঝায় দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমের **প্রাথমিক কার্যক্রম** যেমন নিরাপদ স্থানে সড়িয়ে নেয়া, তল্লাশি ও উদ্ধার কার্যক্রম , ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম।

পুনরুদ্ধারঃ

দুর্যোগের কারণে পারিপার্শ্বিক সম্পদ, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুনরায় নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যক্রমকেই **পুনরুদ্ধার** বাোঝায়।

বিবিধঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার **বিভিন্ন কাজকে পর্যায়ক্রমে সাজাতে** যে কাজটি সর্বপ্রথম করা উচিত সেটি হল-**ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ**।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে— **কমিউনিটি।**

দুর্যোগ **ব্যবস্থাপনা চক্রের ব্যয়বহুল স্তর হচ্ছে** – **দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ** প্রশমন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আবহাওয়া অফিস থেকে সতর্কতা হিসাবে যেসব সংকেত জারি করা হয়, সেগুলোর অর্থঃ

১ নং দূরবর্তী সতর্ক সংকেত:

জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার পর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে পারে। দূরবর্তী এলাকায় একটি ঝড়ো হাওয়ার অঞ্চল রয়েছে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬১ কিলোমিটার (কি.মি.)। ফলে সামুদ্রিক ঝড়ের সৃষ্টি হবে।

২ নং দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত:

দূরে গভীর সাগরে একটি ঝড় সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কি.মি.। বন্দর এখনই ঝড়ে কবলিত হবে না, তবে বন্দর ত্যাগকারী জাহাজ পথে বিপদে পড়তে পারে।

৩ নং স্থানীয় সতর্ক সংকেত:

বন্দর ও বন্দরে নোঙর করা জাহাজগুলোর দুর্যোগ কবলিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বন্দরে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে এবং ঘূর্ণি বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০-৫০ কি.মি. হতে পারে।

৪ নং স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত:

বন্দর ঘূর্ণিঝড় কবলিত। বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ ঘণ্টায় ৫১-৬১ কি.মি.। তবে ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার মতো তেমন বিপজ্জনক সময় এখনও আসেনি।

৫ নং বিপদ সংকেত:

বন্দর ছোট বা মাঝারি তীব্রতর এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়বে। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কি.মি.। ঝড়টি বন্দরকে বাম দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

৬ নং বিপদ সংকেত:

বন্দর ছোট বা মাঝারি তীব্রতর এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়বে। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কি.মি.। ঝড়টি বন্দরকে ডান দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

৭ নং বিপদ সংকেত:

বন্দর ছোট বা মাঝারি তীব্রতর এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়বে। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কি.মি.। ঝড়টি বন্দরের উপর বা এর নিকট দিয়ে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

৮ নং মহাবিপদ সংকেত:

বন্দর প্রচণ্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতর ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়তে পারে। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কি.মি. বা এর বেশি হতে পারে। প্রচণ্ড ঝড়টি বন্দরকে বাম দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করবে।

৯ নং মহাবিপদ সংকেত:

বন্দর প্রচণ্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতর এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়বে। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কি.মি. বা এর বেশি হতে পারে। প্রচণ্ড ঝড়টি বন্দরকে ডান দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করবে।

১০ নং মহাবিপদ সংকেত:

বন্দর প্রচণ্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতর এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়বে। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কি.মি.বা তার বেশি হতে পারে।

১১ নং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সংকেত:

আবহাওয়ার বিপদ সংকেত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্থানীয় আবহাওয়া কর্মকর্তা পরিস্থিতি দুর্যোগপূর্ণ বলে মনে করেন।

মনে রাখতে হবেঃ নদীবন্দর ও সমুদ্র বন্দরের জন্য সতর্কতা সংকেত আলাদা।

সূত্রঃ BBC news বাংলা

গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহঃ

সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র অবস্থিত- নয়াদিল্লি।

সার্ক **আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র (SMRC)** অবস্থিত— আগারগাঁও, ঢাকা।